সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

বাংলা উপন্যাসের মূলধারা ও রমেশচন্দ্র দত্ত

সৌদা আখতার

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)-এর বিপুল পরিমাণ রচনার মধ্যে রয়েছে ছয়টি উপন্যাস। এর চারটি ঐতিহাসিক ও দু'টি সামাজিক উপন্যাস।

বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রবল প্রভাবের সময়ে রচিত হলেও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস তুলনামূলকভাবে সত্যনির্ভর। তার সামাজিক উপন্যাসদ্বয়েও বাস্তব সমাজালেখ্য বিধৃত। তার দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারমুক্ত, ভাষা সরল।

সীমিত আলোচিত ঔপন্যাসিক হলেও রমেশচন্দ্র দত্ত বাস্তবমুখী উপাদান ব্যবহার ও ভাষার সরলতা নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছেন। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে পরবর্তী মূলধারায় এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) যখন রচিত হয় তখনো বাংলা গদ্যের কর্মক্ষম রূপ নির্মিতির উপর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অথচ তার পূর্বে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত "প্রমথনাথ শর্মার *নববাবু বিলাস* প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী" [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪:২২]। করে। অবশ্য সমালোচকের এ'মত গ্রহণযোগ্য কিনা সেটি বিবেচনার বিষয়। কারণ রক্ষণশীলতার ধারক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই "তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় আপাত সূত্রবদ্ধ গল্পের আশ্রয় নিলেও মুখ্যত খণ্ডচিত্র রচনায় আগ্রহ থাকায়" [মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৬৯:৬৭] এখানে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ উপেক্ষিত হয়।

নববাবু বিলাস একজন বাবুর জীবনকাহিনীর ধারাবাহিক পূর্ণ বিবরণ হলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত বেশিই দাবী করেছেন। কারণ পুস্তকটির ভাষা উপন্যাসের অনুপযুক্ত। সমালোচক অন্যত্র নিজেই একথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে এর ভাষা "নানাভঙ্গীর সংমিশ্রণজাত বর্ণসংকর" [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪:ভূমিকা]। বা সাদা কথায় গদ্যে-পদ্যে মেশানো জগাখিচুড়ি ভাষা যা একটি যথার্থ উপন্যাস নির্মাণশৈলীর অন্তরায়। তথাপি ভবানীচরণের এই ভাষাভঙ্গির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কারণ "সরস গদ্যলেখার ঝোঁক ও ক্ষমতা ভবানীচরণের রচনাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়" [চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৫:ভূমিকা]। সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতে এই বিশেষ ভাষাভঙ্গি পরবর্তীকালের উত্তরসূরী প্যারীচাঁদের রচনায় ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়। এরপর ১৮৫২ সালে হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স রচনা করেন *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ*। এ পুস্তকটিকেও উপন্যাসের মর্যাদা দেয়া হয় [আবু হেনা মোস্তাফা কামাল ১৯৭৫:২২]। অবশ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে এতটা ঔদার্য না দেখালেও বলেছেন যে পুস্তকটি উপন্যাস নয় কিন্তু এর মূল্য সমকালের জীবনধারার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪:২৭]। এ গ্রন্থে পাত্রপাত্রীর জীবনাচরণের বিবরণ অপেক্ষা খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য তুলে ধরাই ছিল এই বিদেশিনীর একমাত্র লক্ষ্য। ফলে ধর্ম ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই এ পুস্তকে উপেক্ষিত।

ইতোমধ্যে ১৮৫৮ সালে সমকালীন জীবনের চিত্রকর প্যারীচাঁদ মিত্র প্রকাশ করেন *আলালের ঘরের দুলাল*। উপন্যাস রচনার পথযাত্রায় ভাষার দিক দিয়ে এ গ্রন্থে প্যারীচাঁদ খানিকটা অগ্রসর হলেন। এ পুস্তকে "সাধু ভাষার কাঠামোতে চলিত ভাষার বাক্‌রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে" [কান্তি গুপ্ত ১৯৮৪:৯]। রচিত হল আরেক বাবুর কাহিনী। *নববাবু বিলাস*-এর তুলনায় এর ভাষা এবং বিষয়-বিন্যাস অনেক পরিণত। "তিনি বাংলা গদ্যরীতিতে রঙ্গরস এনেছেন এবং কাহিনী বলার

আকর্ষণী শক্তি তিনি বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন [মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৬৯:৭২]। সমকালের অন্য অনেক লেখকের মত একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি এটি রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সহজ ভাষা এবং পরিচিত বিষয় নিয়ে সেকালের অনতিশিক্ষিত নরনারীর কাছাকাছি যাওয়া[১] [সুকুমার সেন ১৩৭৩:৭৮]। তাঁর সমকালে ভাষা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন দুঃসাহস আর কেউ দেখাননি। এদিকে লক্ষ করেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, এ সময়ে "সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৭৬:৮৬-৮৭]।

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাধন্য হলেও, সমকালে প্যারীচাঁদের এই রচনাটির আঙ্গিক অসম্পূর্ণতা ও ভাষা সুনাম-দুর্নামসহ প্রচণ্ড সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে[২] [সারওয়ার জাহান ১৯৮৩:৬]। তবে আঙ্গিক ও অন্যবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও বাস্তব সমাজভিত্তিক বিষয়বস্তুর সহজ বিন্যাস এ-পুস্তকটিকে সাধারণ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। এর বিষয়বস্তু বাঙালির প্রতিদিনকার জীবন-সমস্যা, যার ভিত্তি *নববাবু* বিলাস এবং *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ*-এর মত পরিপূর্ণ রূপে বাস্তব। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যাশা ছিল যে অতঃপর বাংলা উপন্যাস বাস্তবতার এই 'মূলধারা' অনুসরণ করেই অগ্রসর হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। *আলালের ঘরের দুলাল*-এর পর ১৮৫৯ সালে রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচনা করেন *চন্দ্রমুখী*। কিন্তু এটি মূলতঃ "নকশা জাতীয় রচনা" [কান্তি গুপ্ত ১৯৮৪:১১]। তথাপি গ্রামবাংলার সরলপ্রাণ মানুষের সহজ জীবনাচরণ অত্যন্ত সরল গদ্যভাষায় লিখিত বিধায় পরবর্তীকালের উপন্যাসে বিষয়-ব্যবহারের দিক থেকে এর কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

প্যারীচাঁদের পর বাংলা উপন্যাস-জগতে আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। "সেকালে তিনি একাই বাংলা কথা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি সাধন করেছেন" [দেবীপদ ভট্টাচার্য ১৯৬১:১৫২]। কিন্তু এ সমৃদ্ধি এসেছে উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াসের বাস্তবচেতনার 'মূলধারা'কে পাশ কাটিয়ে। বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তিমূল খুঁজতে গিয়ে আমরা *নববাবু বিলাস, ফুলমনি ও করুণার বিবরণ* এবং *আলালের ঘরের দুলাল* নামে যে তিনটি পুস্তিকার সন্ধান পাই তার উপাদানের ভিত্তিভূমি হচ্ছে বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র এড়িয়ে গেলেন[৩] [সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৮ : ৫৫]।

কারণ সেকালের নব্য শিক্ষিত পাঠক বাস্তব জীবনভিত্তিক রচনাধারার বাঙালিয়ানা অপেক্ষা "দুর্গেশনন্দিনীর সংস্কৃত-নির্ভর ভাষায় ইংরেজি-নির্ভর কাহিনী [দেবেশ রায়

১৩৯৬] গ্রহণে আগ্রহ দেখান বেশি। কারণ এই সদ্য গড়ে ওঠা পাঠকশ্রেণী ছিলেন একাধারে ইংরেজি শিক্ষিত ও নাগরিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত। ফলে ইংরেজি সাহিত্যের রসিক পাঠক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রবণতা সমকালের পাঠক রুচির অনুগামী হওয়ায় তিনি সমাজের নিরাশা-প্রত্যাশা, তার ভাঙচুর ও অবক্ষয়প্রাপ্তির মত মৌলিক এবং বাস্তব সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সুদূর ইতিহাসের অর্ধ-বাস্তব অর্ধ-কল্পনাকে অবলম্বন করে রচনা করলেন *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯) প্রভৃতি ঐতিহাসিক রোমান্স। এসব গ্রন্থে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস পাঠকের চোখে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর লেখক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের গঠনযুগে পাঠকের রস-পিপাসাকে পরিচালিত করলেন বাস্তব বিষয়ানুসারী 'মূলধারা' থেকে ভিন্নতর পথে।

এ ব্যাপারটি সম্ভব হলো এই জন্য যে সেই সময়ের রসজ্ঞ ও বিদগ্ধ নাগরিক পাঠককূল উপন্যাসের স্বাদ গ্রহণের জন্য দ্বারস্থ হতো ইংরেজি সাহিত্যের। "স্কট ডিকেন্স তখন শিক্ষিত পাঠকের প্রিয় লেখক" [মোহিতলাল মজুমদার ১৯৭৩ : ২২১]। এসব পাঠকের মন তখন এ জাতীয় ইংরেজি ধাঁচের উপন্যাসের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যখন ইংরেজি রোমান্সের ছাঁদে মাতৃভাষায় উপন্যাস রচনা করলেন তখন পাঠকশ্রেণী এই অভাবনীয় প্রাপ্তিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে[৪] [মোহিতলাল মজুমদার ১৯৭৩ : ২২১]। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়-বৈচিত্র্য, নাটকীয় পরিবেশ, কাহিনীর জটিল গ্রন্থনা ও ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠককে অন্যবিধ অনুভবের সুযোগই দেননি। ফলে বাস্তব জীবনোপাদানের শিল্পী প্যারীচাঁদ হলেন অবহেলিত। তাঁর প্রদর্শিত পথও পরবর্তীকালের উপন্যাসে বহুকাল অনুসৃত হলনা। *আলালের ঘরের দুলাল* প্রথমবার প্রকাশিত হবার পর তা পাঠকসমাজে আলোড়ন তুললেও আজ তিনি বাংলা সাহিত্যে গবেষণার বিষয়। তাঁর অন্যান্য রচনার সংবাদ বাংলা সাহিত্যের গবেষক-ছাত্র ভিন্ন অন্য কেউ তেমন জানে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শীর্ষে তখন তাঁকে কেন্দ্র করে একদল স্বল্পখ্যাত ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেন। যেমন কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা প্রবণতাকে অনুসরণ করে উপাখ্যান-জাতীয় এবং কাল্পনিক অবাস্তব কাহিনী রচনা করেন। এর উদাহরণ হিসেবে রাজকৃষ্ণ রায়ের *শান্তিকুটীর* (১২৯৫), অবিনাশ দাশের *পলাশবন* (১৮৯৬), দামোদর মুখোপাধ্যায়ের *বিষবিবাহ* (১৮৮৮) ইত্যাদির

নাম করা যেতে পারে। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার চারিত্র্য-নীতি ও সমাজ-ধর্মনীতিকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এঁদের রচনায় "প্রণয় সামাজিক বিধিনির্দেশিত হয়ে এবং স্ত্রী পুরুষের সতীত্ব ও সংযমকে আশ্রয় করে বর্ধিত হবে" [রামদুলাল বসু ১৯৭৪ : ১]—এই নীতি প্রতিফলিত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কণ্ঠমালা* (১৮৭৭), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রেমপ্রতিমা* বা *প্রিয়ম্বদা* (১৮৮৬), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের *হেমাঙ্গিনীর প্রণয়প্রতিমা* (১২৮৪) প্রভৃতি।

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে একালে রচিত হয় বিপুলাকৃতির সাহিত্য-প্রয়াস। লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণকারীদের অধিকাংশই তাঁর রচনার বিভিন্ন প্রবণতাকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত রচনা-প্রয়াসকে সার্বিকভাবে অনুকরণের ক্ষমতা এদের প্রায় কারোরই ছিল না। ফলে দুয়েকজন ছাড়া অন্য সকলেই বঙ্কিম-প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ রইলেন। ব্যতিক্রমী দুয়েকজনের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তবে তারকনাথ অপেক্ষাও রমেশচন্দ্রের খ্যাতি-কৃতিত্ব বহুমুখী। ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদ-সাহিত্যিক ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক রমেশচন্দ্র সমকালে একজন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কর্মকুশল *সিভিলিয়ান* হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ইংরেজিতে রচিত তাঁর গ্রন্থসংখ্যা মোট আঠারটি। তাঁর বাংলা সাহিত্য চর্চার দুটি প্রধান দিক হচ্ছে উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্য। তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত *ঋগ্বেদ সংহিতা* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমকালে রমেশচন্দ্র অর্থনীতির ইতিহাসবিদ এবং একজন বহুমুখী বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুবছর পর ১৯১১ সালে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গাইকোয়াড তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ সূত্রে বলেছেন যে, "The literary achievements ... have made the name of Romesh Dutt widely known in the west as well as in India ..." [Gupta ১৯৮৬:vii]; অর্থাৎ রমেশচন্দ্রের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতাই নয়-তাঁর সাহিত্যকর্মও পাশ্চাত্যে ও দেশে তাঁকে সেকালে ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছিল।

রমেশচন্দ্র যখন ইউরোপে তখন তাঁকে ভারতীয় সংস্কার কর্মসূচীর "the most distinguished advocate, by speech and pen"[Gupta ১৯৮৬ : vii]

হিসেবে মর্যাদা দেয়া হত। যিনি একদা বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিদেশীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন, পরবর্তীকালে তাঁর সে অবদান প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে চলে যায়।

উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচকই রমেশচন্দ্রকে বঙ্কিমানুসারী ঔপন্যাসিক রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৫] তাঁর রচনায় এঁরা ছোটখাট কিছু মৌলিকত্বের সন্ধান পেলেও রচনাগুলোর ধারাবাহিক বিবর্তনে একটি বিশেষ প্রবণতার জন্ম ও পরিচর্যার বিষয়টি এঁদের কৌতূহলের অগোচরেই থেকে গেছে বলে আমরা মনে করি। রমেশচন্দ্র বঙ্কিম-প্রভাব-বলয়ের লেখক-একথা স্বীকার করে নিলেও দেখা যায় যে তাঁর অনুসরণের মধ্যে এক ধরনের প্রবল স্বকীয়তা বিদ্যমান। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ের ভিত্তি ছিল বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস। এই দ্বিবিধ প্রবণতার সাহায্যেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-রহস্য থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জীবন-নিষ্ঠ উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদচারণার সূচনা করেন।

অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসমূহে বাস্তবতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের একটি বিশেষ প্রবণতা সকলের অলক্ষেই নিঃসরিত হচ্ছিল– যা তাঁর শেষ উপন্যাসদ্বয়ে নদীপ্রবাহের মত একমুখীন সম্পূর্ণতা লাভ করে। রমেশচন্দ্র তাঁর প্রথম চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপাদান ব্যবহারের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং সমকাল দ্বারা প্রভাবিত হলেও অচিরেই তিনি সে পথ থেকে সরে আসেন। এক অর্থে এরপরে তিনি বাংলা উপন্যাস শিল্পকে প্রবহমান অনুকরণের তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করেন এবং নতুন পথের সন্ধান দেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ পথের প্রতি প্রথম ইঙ্গিত করলেও তাঁর পরিসর বিস্তৃততর ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের হাতেই। তবে তারকনাথ-রমেশচন্দ্র এই বাস্তব জীবনভিত্তিক ধারাটির উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন 'বাবুর উপাখ্যান- *নববাবু বিলাস-আলালের ঘরের দুলাল*-এর বাস্তবানুগামিত্ব থেকে। এভাবে ঐতিহ্যপ্রীতির সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দোর্দন্ড প্রতাপ-প্রভাবের কালে বাস করেও রমেশচন্দ্র তাঁর "ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে কাল্পনিকতা থেকে সত্যনিষ্ঠার দিকে, রোমান্সের কুহেলিকামণ্ডিত, মায়াময় রহস্যময় ও অস্পষ্ট জগৎ থেকে স্পষ্টতার দিকে যাত্রা করেছেন"[অমরেন্দ্র গণাই ১৩৮৬:১৩]।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাশৈলীর সরলতাকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেইন অস্টিনের উপন্যাসের প্রাণবন্ত সারল্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ৫৯]। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে উত্তরাধিকারের যে সম্ভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করে তার অন্যতম হল এই সহজ সরল চিত্রণ-কৌশল। রমেশচন্দ্রের

সমস্ত জীবনের কর্মসাধনায় নিরন্ন রায়ত আর নির্যাতিত ভূমিহীনদের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অনুমান করা যায়, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য-প্রয়াসে। তাঁর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গণমানুষের যে চিত্র অন্তরালে ছিল রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাদের উপস্থিতি অবশ্য একেবারে আকস্মিক নয়। উপন্যসের মূল ধারার সঙ্গে তা সম্পর্কিত। শুধু প্যারীচাঁদের রচনায় অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়েছে শহর এবং সেক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র ব্যবহার করেছেন গ্রাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের আশ্রয়স্থল গ্রাম হলেও তার বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের "জীবনধর্মী-উপন্যাস *বিষবৃক্ষ*, *কৃষ্ণকান্তের উইলের* সমৃদ্ধ ধারা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কেউই বহন করতে পারেনি, অন্যেরা তারকনাথ-রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের ধারাই বহন করেছেন [দেবীপদ ভট্টচার্য ১৯৬১ : ১৬৯]।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুবিদিত। সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ-পটভূমির দিক থেকে ভিন্নপথ অবলম্বন করলেও তা এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সন্নিকটবর্তী। তাঁর উপন্যাসে শহুরে উচ্চবিত্ত ও সংস্কৃতিঋদ্ধ মানব-মানবীর সূক্ষ্ম জীবনবোধে "প্রথম হইতেই ভাবকল্পনার একটা নূতন অভিব্যক্তি দেখা গেল [মোহিতলাল মজুমদার ১৯৭৩ : ২২১]। আসলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত পথেরই আরো সূক্ষ্ম বাস্তবতার ভিন্ন ধারার পথিকৃৎ। ফলে তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, "রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ী ভাবকল্পনা বাঙালীকে রসের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করার অধিকার" [মোহিতলাল মজুমদার ১৯৭৩ : ২২৭]। দেয়। কিন্তু "পল্লীগ্রাম, দ্বন্দ্ব বহুল সংসার ও পরিবার, দারিদ্র্য, ঈর্ষা-বিদ্বেষের খরতাপক্লিষ্ট জীবনযাত্রার অন্তর্নিহিত প্রখর বাস্তবতা হইতে তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয় কবিপ্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়াছে।" [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ১৯৬]। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশিষ্ট শ্রেণীর বিদগ্ধ পাঠক সমাজে জনপ্রিয় হলেও অনতিশিক্ষিত সাধারণ পাঠকবৃন্দের কাছে তিনি দূরের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সাধারণ গ্রাম্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হলেও তা তাঁর অন্তর্গত কবিপ্রকৃতির কারণেই অসাধারণত্বের দ্যুতি নিয়ে আদর্শায়িত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পথ ভিন্ন। দুজনেই প্যারীচাঁদের ঐতিহ্য থেকে একটু সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এছাড়াও পথ ছিল। প্যারীচাঁদকে স্মরণে রেখে তারকনাথ *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪) উপন্যাসে যে পথের ইঙ্গিত দিয়েই থেমে যান, রমেশচন্দ্র সে পথটিকেই ঘষে মেজে পরবর্তী প্রজন্মের পদপাতের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। তবে প্যারীচাঁদের ঐতিহ্যের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের সামান্য পার্থক্য আছে। প্যারীচাঁদ

মূলত শহুরে জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন আর রমেশচন্দ্র গ্রাম্য সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তবে দুজনেই যেহেতু সমকালীন বাস্তব জীবনসমস্যা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন সে কারণে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকশ্রেণীর কাছে এঁরা বিপুলভাবে আদৃত। এই অর্থে সাধারণ পাঠকশ্রেণীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগের শূন্যস্থানটি পূরণ করেন রমেশচন্দ্র।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাস্তব জীবনভিত্তিক উপন্যাস-ধারায় *আলালের ঘরের দুলাল*-এর পরবর্তী পথিকৃৎ তারকনাথ। সমসাময়িক জীবন নিয়ে রচিত এঁর *স্বর্ণলতা* সমকালে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর কাহিনীতে উচ্চবিত্তের পাশাপাশি নিম্নবিত্তের জীবনচিত্রও লভ্য। লেখকের একান্ত লক্ষ্য ছিল একান্তবর্তী পরিবারের ভাঙনের ফলে যে বিশৃঙ্খলা ও মর্মবিদারী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা দেখানো। এখানে *আলালের ঘরের দুলাল*-এর মত মোটাদাগের আদর্শ প্রচারিত। লেখকের দৃষ্টি সামাজিক ভাঙচুর এবং আদর্শবাদিতার প্রতি নিবদ্ধ থাকায় সমকালীন সমাজ এতে বিম্বিত হয়েছে সত্য, কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রণয় সর্বাংশে বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। উপন্যাসটির প্রথমাংশে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এবং দ্বিতীয়াংশে প্রণয় মুখ্য। চরিত্রগুলো *আলালের ঘরের দুলাল*-এর মত ভালো এবং মন্দ এই মোটা দাগের নীতি নিয়মে বিন্যস্ত। এর পাশাপাশি রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসদ্বয়ের অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে নিম্নবিত্ত গৃহস্থঘরের কাহিনী এবং তাঁর পাত্র-পাত্রী মোটামুটিভাবে পূর্ণায়ত চরিত্র।

তারকনাথ যখন উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি ধারার প্রতি ইঙ্গিত করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে একটি শক্তিশালী অনুকারচক্র গড়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সমকালের প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনী *পালামৌ*-এর লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি *মাধবীলতা* ও *কণ্ঠমালা* নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেন। *মাধবীলতা* মূলত রাজরাজড়ার কাহিনী এবং *কণ্ঠমালায়* আছে রোমান্সসুলভ অসম্ভাব্যতার ছড়াছড়ি।[২৯] এসময় প্রতাপচন্দ্র ঘোষও (?-১৯২১) "বঙ্কিম আদর্শ প্রভাবিত ওবঙ্কিম-রচনা-প্রণালী-অনুসারী ঔপন্যাসিক। [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ১৯৪]। এঁর উপন্যাসকে "গবেষণা স্পৃহার একটি উজ্জ্বল শিল্প স্বাক্ষর" [রামদুলাল বসু ১৯৭৪ : ১৩] বলে প্রশংসা করা হলেও তৎসম শব্দের আধিক্য, যতি চিহ্নের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার, অনাবশ্যক প্রসঙ্গ ও চরিত্রের অবতারণা প্রভৃতি কারণে বিরূপ সমালোচনাও করা হয়। [রামদুলাল বসু ১৯৭৪ : ১৬]। এ ছাড়া বঙ্কিমানুসারী অন্যান্যদের মধ্যে বিনোদ বিহারী গোস্বামীর উপন্যাস *পূর্ণশশী*

(১৮৭৫), ললিতমোহন ঘোষের *অচলবাসিনী* (১৮৭৫) হারাণ চন্দ্র রাহার *রণচণ্ডী* (১৮৭৬), কেদারনাথ চক্রবর্তীর *চন্দ্রকেতু* (১৮৭৫), প্রভৃতি ব্যর্থ-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি পাঠকের বিরাগ জন্মায় এমন ধারণা অসঙ্গত নয়। এসময় তারকনাথ বিশ্বাস *সুহাসিনী* (১৮৮২) নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থটির প্রথমাংশে পারিবারিক কাহিনী থাকলেও শেষাংশে ইতিহাসের সিরাজউদ্দৌলার আবির্ভাব আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য। ফলে এই রচনাকারদের, উপন্যাস রচনার প্রথমকালে ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেয়া হলেও পরবর্তীকালে এঁরা কোথাও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হননি।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক জীবনের শেষদিকে তাঁর সুদূরে নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন সমাজ জীবনের জটিল বাস্তবতায়। কিন্তু এসব উপন্যাসেও তাঁর মানস-প্রবণতার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়না। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলোয় বিবৃত হয়েছে মূলত রাজা-বাদশাদের জীবন। তিনি যখন সমকালীন সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তখন তাঁর অবলম্বন হল সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দাসদাসী পরিবৃত সামন্ত-জীবনালেখ্য। দেখা গেল যে এদের জীবন-চিত্রণেও কল্পনার আতিশয্যজনিত রোমান্সের প্রতি তাঁর আনুগত্য কিছু পরিমাণে থেকেই গেল। কিন্তু রমেশচন্দ্র তাঁর দৃষ্টি শুধু প্রাত্যহিক জীবনেই ফিরিয়ে আনেননি। তিনি বাঙালীর সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনা, নির্যাতন-গ্লানিকে আবিলতাহীন স্বচ্ছ চোখে দেখার চেষ্টা করেছেন।

রমেশচন্দ্র রচিত মোট ছয়টি উপন্যাসের মধ্যে সর্বশেষ দুটি উপন্যাসে বাস্তব সমাজালেখ্য বিধৃত। এগুলো হচ্ছে *সংসার* (১৮৮৬) ও *সমাজ* (১৮৯৪)। উনিশ শতকের হিন্দু সমাজকর্মীদের কাছে বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-বালবিধবা-কৌলীন্য প্রভৃতি সমাধানহীন বিকট সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র এই সমস্যাগুলিকেই সাহসী ও বিচক্ষণ সমাধানের ইঙ্গিতসহ তাঁর সামাজিক উপন্যাসদ্বয়ে তুলে ধরেছেন। *বিষবৃক্ষ* এবং *কৃষ্ণকান্তের উইলের* মত *সংসার-সমাজ*-এর উদ্দেশ্যও ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজসেবা। তবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিধবাবিবাহের কুফল দেখান নি। বরং বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহে সমাজের যে উপকার সাধিত হয় তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সমাজের সকলকে যুগোপযোগী নীতি নিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। রমেশচন্দ্র প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নাই।

হেমচন্দ্র-বিন্দু-শরৎ-সুধা, এই চারটি চরিত্রকে ঘিরেই *সংসার* ও *সমাজ* উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত। হেম-বিন্দুর দাম্পত্য-মাধুর্য এবং বাল্যবিধবা সুধা ও শরতের অন্তরঙ্গতা *সংসার* উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। শরৎ এবং সুধার সম্পর্ক সংসারের অন্তরালে থেকেই ধীরে ধীরে গাঢ়তর হয়ে পরিণয়ের দ্বারে পৌঁছায়। তখন একদিকে সমাজের রক্তচক্ষু অন্যদিকে শরতের মায়ের অসম্মতি তাদের ভবিষৎ মিলনের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হযে দাঁড়ায়। শরৎ জানায় লোকলজ্জা আর সমাজের অন্যায় শাসনকে সে ভয় পায় না। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা তার দুঃসাধ্য। ইতোমধ্যে শরতের বোন কালীতারা বংশকৌলীন্যের শিকার হয়ে অকস্মাৎ বৈধব্য বরণ করলে তাদের মায়ের মত পরিবর্তিত হয় এবং শরৎ-সুধার মিলন ঘটে। একই কালের নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এখানেই রমেশচন্দ্রের ও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিধবা নায়িকা কুন্দ ও রোহিনীর অপমৃত্যু প্রমাণ করে তিনি তৎকালীন সামাজিক অনুমোদনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। কিন্তু রমেশচন্দ্রের বিধবা নায়িকা সুধার সফল দাম্পত্য পাঠককে প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে জীবনের মহত্তর বোধকে সংকীর্ণতামুক্ত রাখতে অনুপ্রাণিত করে। প্রমাণ করে যে তুচ্ছ সামাজিক অনুশাসন অপেক্ষা নারীর মর্যাদা অনেক বেশি।

রমেশচন্দ্রের *সংসার* উপন্যাসটি আরো একটি ব্যাপারে উল্লেখের দাবী রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের রচনায় ব্যক্তি-চরিত্র রূপায়ণ অপেক্ষা ঘটনা প্রাধান্যই বেশি লক্ষিত হয়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও ঘটনাস্রোতে চরিত্রের ভাসমানতা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপেই উপস্থিত। চরিত্রগুলির বাহ্যিক আচার-আচরণ দিয়েই তাদের বিচার করতে হয়। শুধু *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে বারুণী পুষ্করিণী নিয়ে রোহিণীর মানস বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস আছে। অন্যত্র লেখকের নিজস্ব মতামত ছাড়া এ-বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত। অথচ সমকালের *সংসার* উপন্যাসের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের প্রায় পুরোটাই সুধার আত্মচিন্তা, তার মনের গভীরে সুপ্ত প্রত্যাশা-প্রাপ্তির চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। সমাজ নির্যাতিত বাল-বিধবার যে অব্যক্ত মনোবেদনা সবার অগোচরে সঞ্চিত স্তূপিকৃত হয় সেই অনুক্ত বাণী আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিচরিত্রটিকে আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলেছে। দয়িতকে ঘিরে সুখ-সৌভাগ্যের চিন্তামগ্ন কিশোরীটি সমাজে তার অবস্থানের কথা জানে এবং সেজন্যই অভিভূত অবস্থাতেও সে সেখানে অন্যের পদশব্দে চকিত-শঙ্কিত হয়ে ওঠে" পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায় ... পাছে কেহ জানিতে পারে" [রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯৮২ : ৪০২]।

সংসার রচনার সতের বছর পরে ১৯০৩-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*কে উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রতর্বক" [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ১৪৯] হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এবং কারণ হিসেবে এর 'মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ'কে প্রাধান্য দেয়া হয়। লক্ষ করার বিষয় এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের রচনাতেই স্পষ্টতর। রমেশচন্দ্র অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অধিকতর শিল্পবোধসম্পন্ন বিধায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই আমরা তাঁর সামঞ্জস্য খুঁজে নিই। অথচ উপাদান বিচার করলে দেখা যাবে পরবর্তীকালের লেখকদের মনস্তত্ত্বসমৃদ্ধ উপন্যাসগুলি দূরায়তভাবে হলেও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের কাছে কমবেশি ঋণী। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে প্রচারধর্মিতার আধিক্য তার শিল্পবোধের অন্তরায় হয়ে পড়েছে প্রায়শ; তবু তার অঙ্কিত মায়ের চরিত্রের স্নেহ কাতরতা, উচ্চবংশীয় বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরী কন্যার দাম্পত্য ব্যর্থতা, হতদরিদ্র সনাতন কৈবর্তের সংসার ও তারিণী মল্লিক প্রভৃতি চরিত্র স্বাভাবিকতার রঙে উজ্জ্বল, যা পাঠকের বোধকে উজ্জীবিত করে।

সমাজ উপন্যাসটি *সংসার*-এর শরৎ-সুধার সফল দাম্পত্য এবং তাদের কন্যা সুশীলার অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা নিয়ে রচিত। *সমাজ* উপন্যাসটি *সংসারে*র পাত্র-পাত্রীদের আট বছর পরের ঘটনা নিয়ে লিখিত। তবে এখানে কিছু নতুন কাহিনীও সংযোজিত। উপন্যাসটির ঘটনাকাল দুটি ভাগে বিভক্ত। একটির ঘটনাস্থল *সংসারে*র মতই তালপুকুর গ্রাম এবং অপরটির তালপুকুরের নিকটবর্তী সনাতনবাটির জমিদার গৃহ। এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র তারিণীর মৃত্যুরহস্যের ঘটনা বিশ্লেষণে রমেশচন্দ্রের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা এখানে কামিনীকান্তের চরিত্র দিয়ে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ উপপত্নী খাজেস্তা বিবির নৃত্যগীতের আসরে মদ্যপানের হুল্লোড়ের হোতা এই কামিনীকান্তই আবার 'বৃহৎ জাতি সংরক্ষণ সমাজ' স্থাপন করে দেশাচারের রক্ষাকর্তা হিসেবে সমাজে নিজের মর্যাদার আসনটি স্থায়ী করার চেষ্টা করে। মনে রাখা দরকার যে এই দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রে শুধু প্রগতি চিন্তার স্ফুরণ ঘটাননি, একই সঙ্গে তিনি বাংলা উপন্যাসের 'মূলধারার' বাস্তব উপাদানের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে এ ধারা অনুসরণের উৎসাহও যুগিয়ে গেছেন।

রমেশচন্দ্র ইংরেজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ শাসক-প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পান। এ সময় নিষ্ঠাবান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের মত তিনি চতুর্দিকের মানুষজন, তাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা

করেছেন। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন আছে তাঁর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাসে। শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি বাংলার নিম্নবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় ও দ্বন্দ্ব-সমস্যা সম্পর্কে এক নিবিড়-অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এইসব সাধারণ মানুষকে বাংলার বৃহত্তর সমাজ-প্রতিবেশে হৃদয়াবেগের ঘনিষ্ঠ আলোকে দেখেছেন শরৎচন্দ্র। বাংলার সমাজ-পরিবেশের এমন প্রত্যক্ষ-জীবন্ত ও বাস্তব রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যের আর কারো উপন্যাসে লভ্য নয়। মনে হয় বাংলার অবহেলিত গ্রাম্যজীবনকে সহানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে তুলে আনার এ প্রবণতা সচেতন বা অবচেতনভাবে তিনি রমেশচন্দ্রের ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট ভূস্বামী পরিবারের হৃদয়াশ্রিত সমস্যা অথবা তারকনাথের গ্রাম্য-মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনজনিত বিশৃঙ্খলা অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে গ্রামের সহজ সাধারণ মানুষদের যে বিবর্ণ চিত্র উঠে এসেছে তার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের *সংসার* উপন্যাসের পটভূমির সাদৃশ্য সর্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গ্রামবাংলার হতদরিদ্র মানুষদের যে বর্ণনা অসম্পূর্ণ ছিল তা রমেশচন্দ্রের রচনায় এসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে রমেশচন্দ্রের শেষ দুটি উপন্যাসে যে প্রবণতার চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল তা যেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করেছে। তবে এ দুজনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে রমেশচন্দ্র গ্রাম-সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন অধিক। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে সেই সমাজের গ্লানি ও বিকৃতির রূপচিত্র তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যেই খ্যাতিমান-প্রতিভাবান ও সার্থকনামা লেখকদের নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয় অধিক। এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতিমান লেখকদের পাশাপাশি, পূর্বে বা পরে কিছু অনতিখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব লক্ষিত হয়। এদের প্রয়াস সীমিত, অবদান সামান্য। কিন্তু এরাই পর্বত ধারণকারী সানুদেশ। সাহিত্যের পরিসরকে এক প্রতিভা থেকে অন্য প্রতিভা পর্যন্ত প্রসারিত ও অগ্রসর করে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাবান লেখক যেমন সাহিত্যকে একেক কালে তার একেক প্রকার পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার চূড়ান্তে নিয়ে যান তেমনি অন্য সময় অনতিখ্যাত এবং অখ্যাত লেখকদের অবদানও কিন্তু কম নয়। কারণ তাঁদের নিরলস প্রয়াসের ফলেই সাহিত্যের ধারাবাহিকতা থাকে অব্যাহত।

একজন স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিক "তাঁর অসফল ও অসার্থক রচনার মধ্যে যে সার্থকতার ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত রেখে গেলেন, তার সূত্র ধরে পরবর্তীকালে কোন

শিল্পী তাঁর শিল্পে পরিপূর্ণ সাফল্য ও সার্থকতা আনলেন, যা একটি নতুন-ধারার সৃষ্টি করল কিংবা গতানুগতিক ধারায় পরিবর্তন আনল" [রামদুলাল বসু ১৯৭৪ : ভূমিকা] এমন ঘটনা শিল্প-সাহিত্যে বিরল নয়। যে কোন সাহিত্যেই ক্রমান্বয়ে শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেই যাচ্ছে এমন ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু দুজন প্রতিভাবান লেখকের মধ্যবর্তী পরিসরে সাহিত্য থমকে থাকে না। সাহিত্যের চলনোন্মুখ ধারাকে তখন অস্পিষ্ট পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এইসব অনতিখ্যাত লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই জনপ্রিয় রমেশচন্দ্র দত্ত এমনি একজন সীমিত শক্তিধর ঔপন্যাসিক, যিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের বাস্তবমুখী উপাদান ব্যবহার ও ভাষার সরলতা দিয়ে প্রভাবিত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে *দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার* মত ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিবর্তে লিখিত হয়েছে *পল্লীসমাজ-পদ্মানদীর মাঝি-হাসুলিবাঁকের উপকথার* মত বাস্তব জীবনভিত্তিক উপন্যাস।

টীকা

১। প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ১৬ই আগস্ট, ১৮৫৪ সালে প্রকাশ করেন *মাসিক পত্রিকা*। এই পত্রিকায় পাঠকদের জানানো হয়' 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে।'।

২। সমালোচক সারওয়ার জাহানের মতে "দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের কিছুকাল পর থেকে 'চোখের বালি' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত, এই কালে বঙ্কিম–উপন্যাসের বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া যেমন সবচেয়ে বেশি মাত্রায় লক্ষণীয় ... প্রভাবও এ সময়ে ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর।"

৩। উপন্যাসে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার অন্যতম কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ মানসিকতা। "মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে স্পর্শ করতনা।" এই কারণের সঙ্গে ছিল সমকালের পাঠক-রুচির প্রশ্ন।

৪। সমালোচক মোহিতলালের মতে "শেকসপীয়রের নাটক, স্কটের রোমান্স পড়িয়া এককালে বাঙালীর প্রাণে যে ক্ষুধা জাগিয়াছিল তাহা বঙ্কিম কতকটা তৃপ্ত করিয়াছিলেন।"

৫। সমালোচক সারোয়ার জাহানের মতে বঙ্কিম-সমকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের ওপর বঙ্কিমের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল দীর্ঘকাল। এমনকি শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায়, ঔপন্যাসিকগণ যেন নিরুপায় হয়েই বঙ্কিম পরিমণ্ডলে আবর্তিত হতে থাকেন [সারোয়ার, ১৯৮৯ : ২]।

গ্রন্থপঞ্জি

অমরেন্দ্র গণণই ১৩৮৬	*উত্তরাধিকার ও শরৎচন্দ্র*। কলকাতা
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল ১৯৭৫	*ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়*। চট্টগ্রাম।
কান্তি গুপ্ত ১৯৮৪	*উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি*। কলকাতা।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম) ১৩৬৫	*ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*। কলকাতা।
দেবীপদ ভট্টচার্য ১৯৬১	*উপন্যাসের কথা*। কলকাতা।
দেবেশ রায় ১৩৯৬	'বাংলা কথাসাহিত্য ঐতিহ্য ও আধুনিকতা', *বিজ্ঞাপন পর্ব*, ১৭ : ১-২।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৭৬	*'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র'*, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৬৯	*আধুনিক বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা।
মোহিতলাল মজুমদার ১৯৭৩	*আধুনিক বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা।
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯৮২	*রমেশ রচনাবলী, সমগ্র উপন্যাস*। কলকাতা।
রামদুলাল বসু ১৯৭৪	বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ উপন্যাসিকবৃন্দ। কলকাতা।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪	*কথাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৮ — *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা।

সারওয়ার জাহান ১৯৮৩ — *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: মূল্যায়ণের পালাবদল*। ঢাকা।

সুকুমার সেন ১৩৭৩ — *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*। কলকাতা।

GUPTA, J. N. ১৯৮৬ — *Life and Works of Romesh* Chandra Dutt. Caleutta.